amantran
HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING
Exquisite Caterer
HOUSE OF EXQUISITE CATERING & SERVICING
P-132, LAKE TOWN, BLOCK-A, KOLKATA-700 089
P-2521 3554/2534 9879/2534 6653
M-98300 49738

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

SIKSHA . SEVA . SWANIRBHARATA
GANDHI SEVA SANGHA
CALCUTTA - 40

কলকাতা ২৯ শ্রাবণ ১৪২৩ ● রবিবার ১৪ আগস্ট ২০১৬ ● ২ টাকা

বর্ষা যখন বাঙ্ময়

রণবীর পুরকায়স্থ

'ধূমজ্যোতি সলিল মরুতাং সন্নিপাত ক্ব মেঘঃ।'
বাতাস জল ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়।
এই তো মেঘ। মেঘে জল। জলে বর্ষা। বর্ষার সজল রূপ।
কালিদাসের বর্ণনা আর বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। এরচেয়ে মোক্ষম যুগলবন্দী আর কী হতে পারে। তবে প্রশ্ন জাগে একি শুধুই বর্ণনা, না মেঘবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, যার সজলঘন বরিষণে, মন উচাটনে হয় তৃষ্ণার শান্তি সকরুণ কান্তি। বর্ষা শুধু এক ঋতু নয় বাঙালি জীবনে, বাঙালির জীবন প্রণালিই স্তব্ধ হয়ে থাকে যতক্ষণ না বর্ষা সমাগমে নদীনালা ভরে ওঠে, বাঙালির মন সজল হয়। বাঙালিজীবনে চার ঋতু না ছয় ঋতুর বিতর্ক আবহমানের। সে চার হোক বা ছয় হোক বর্ষার মতো মোহিনী মায়া আর কারও নেই। ঋতুবদল মানে তো আকাশেরও সাজবদল, ঋতুরঙ্গ নাট্যশালায় নটরাজের তা তা থৈ থৈ। ধারানৃত্যের অভিনবত্বে তাই বর্ষা বিশিষ্ট, বর্ষা আছে বলেই পৃথিবী উর্বরা, শষ্যশ্যামলা, কবিহৃদয় উতলা। এই বর্ষার রূপ দেখেই বাংলার এক আদিকবি রচনা করেছিলেন প্রথম শ্লোক --
মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তংভীরু রয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
যে যাই বলুক, যতই ভগবততত্ত্ব বিশ্লেষিত হোক, 'রাধে গৃহং প্রাপয়' বলতে বর্ষা সন্ধ্যায়, দায়িত সম্ভাষণের এমন মোক্ষম প্রয়োগ বাঙলায়-ই সম্ভব।
এবার ফেরা যাক বাস্তবের ভূমিতে। 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে। কেন এমন প্রিয় বর্ষাঋতু বঙ্গজীবনে। প্রথম ঋতুর তীব্র দাবদাহে রুষ্ট নটরাজের প্রলয় থামাতে ধারা বর্ষণের বিকল্প যে আর নেই। উষ্ণায়নের গ্রীনহাউস প্রভাব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জল ঢেলে দেওয়া। বর্ষার আগমনে অনেকটাই নির্জীব হয়ে যায় দূষিত গ্যাস। তাই বর্ষার জন্য হা-পিত্যেস, কোথায় পাব তারে। কবে কোন শৈশবে শেখানো হয়েছিল, জুন মাসের ছয় থেকে সাত তারিখের মধ্যে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বর্ষাদেবীর আগমন হয় শ্যাম-বঙ্গদেশে। কিন্তু কোথায় কী, কত সাধাসাধি, তেল-সিন্দুর দিয়ে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। গান গাওয়া হয় মাটিফাটা রোদ্দুরে, আল্লা মেঘ দে পানি দে। তারপর আবহাওয়া দফতর থেকে আকাশবাণী শোনানো হয় দূরদর্শনে, ওড়িশা উপকূলের ঘূর্ণাবর্ত মৌসুমি বায়ুকে ধাক্কা মেরে দক্ষিণবঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়ায় অনেক যদি পূর্ণ হলো ধারা বরিষণ।
তাও যদি শোনেন বরুণদেব। সময়ের সাধাসাধি বিফল গেলে বাঙালি বলে কুছ পরোয়া নেই। চলো যাই মেঘের দেশে। ভ্রমণ বিলাসী বাঙালি মেঘালয়ের আনবাড়ি গিয়ে দেখে মেঘের খেলা। মেঘবৃষ্টির দেশ চেরাপুঞ্জির যত্রতত্র যখন তখন দেখা পাওয়া যায় মেঘের। বাঙালি কবি যেমন লিখেছিলেন 'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে'। অন্য এক বাঙালি কবিও কালিদাসের মতো কাণ্ড করে বসলেন চেরাপুঞ্জির মেঘ বাংলায় না দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন অন্য কোথা। বললেন যাও মেঘ বল তারে--
'চেরাপুঞ্জির থেকে একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবিসাহারার বুকে।'
বর্ষার মেঘবর্ণনায় চেরাপুঞ্জির সঙ্গে আলি সাহেবের কথাও এসে যায় প্রাসঙ্গিক। চেরাপুঞ্জিতে মেঘের ওড়াওড়ি দেখে তার নিজস্ব উপভাষা সিলেটি এক ছড়ায় মেঘ বর্ণনা করেছিলেন--
'পিঞ্জা মেঘর আঞ্জাআঞ্জি/চেরাপুঞ্জির পাড়ো।/ধলা ভেড়া ফাল দি পড়ে/কালা ভেড়ার ঘাড়ো।'
এমন লৌকিক বর্ণনা আর হয় না। একটু সুত্র ধরিয়ে দেওয়া যায় উপভাষায় মান্য রূপে--
'পেঁজা মেঘের ওড়াওড়ি/চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে।/যেন সাদা ভেড়া লাফিয়ে পড়েছে/কালো ভেড়ার ঘাড়ে'।
কী দারুণ, না!
বর্ষার রূপকথায় তাঁর কথা না বলে কি পার পাওয়া যায়। বাঙালি তো তাঁর বকলমেই বর্ষা উপভোগ করে যাচ্ছে দেড়শ বছর ধরে, অন্যূন একশ এগারটি বর্ষার গান লিখছেন যে মহামহিম।
তিনি রাজার রাজা। তাঁর বর্ষামঙ্গল আর মেঘদূত নামের কবিতা থেকে আবৃতি করে বাঙালিকে বর্ষামুগ্ধ করে রেখেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মেঘলা বিকেলে বাঙালি সুরে-বেসুরে এখনও গায় চিরচেনা চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় কণ্ঠের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'।
কিংবা বিদ্যাপতির পদকথায় বিরহ 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূণ্য মন্দির মোর।' কিংবা অতুল প্রসাদের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে।'/ডাকিছে দাদুরি মিলন পিয়াসি গাইতে গাইতে অবাক হয়ে দাদুরি শব্দের দাদুরিকেও খুব পছন্দ হয়ে যায় বাঙালির। বর্ষার অনুষঙ্গে সেই উর্দু শায়রি তো সব বিরহীরই জানা। 'হে বর্ষা এতবেশি ঝ'রো না যে আমার প্রেয়সী আমার কাছে আসতে না পারে। ও এসে যাওয়ার পর এমন মুষলধারায় ঝরো যেন ও যেতে না পারে।'
বর্ষার সঙ্গে লৌকিক দেবতার অনুসঙ্গ যে কত নিবিড় তার রেশ পাওয়া যায় শ্রাবণ শেষে মনসা পূজার বৈচিত্রে। বরাক উপত্যকার কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা পাঠও বর্ষার এক অনুপম উপভোগ--
'সপ্তডিঙা মধুকর চারি দিকে জল শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসামঙ্গল।/পচাপাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা/ছেঁড়া কাথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রণা/হু হু করা কালসন্ধ্যা ভেসে আসা গানে/সায়েব ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।'

এরপর ৫ পাতায়

অঙ্কন : স্বপন দেবনাথ

বর্ষা তোমায় প্রণাম

বাসুদেব ঘোষ

ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটতে শুরু করেছে। আধো অন্ধকারে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। সানশেডের টিনের চালের উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টির ছন্দিত আওয়াজ হয়েই চলেছে। কবিতার ছন্দে একনাগাড়ে কে যেন গান গেয়ে যায়। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যের খরতাপে ধরিত্রীর বুকের উপরকার মানব বা মনুষ্যতর প্রানীদের ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে। কণ্ঠে বেজে ওঠে আল্লা মেঘ দে, পানি দে। আর তখনই মানবের কাতর আহবানে ভগবান/আল্লা তাদের কে স্বস্তি দিতে আকাশ থেকে করুণা ধারায় বর্ষণ করেন। ধরিত্রী শীতল হয়। মানুষ শান্তি পায়। মনুষ্যতর জীব আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। প্রথমে ঈশাণ কোণে একখন্ড কালো মেঘের অবতারণা। তারপর তার ব্যাপ্তি সমস্ত আকাশ ছড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গর্জন করে প্রকৃতি তার সমস্ত অমৃত ধারা নিয়ে নিচে নেমে আসে।
বৃষ্টির ছাঁট থেকে মাথাটুকু বাঁচানোর প্রয়াস শুরু হয়। পথিক গাছের নীচে-শেডের নীচে অথবা গৃহস্থের বারান্দার নীচে একটুবা দাঁড়ায়। তখন কি তাদের মনে রবি ঠাকুর ভেসে আসে আজি ঝর ঝর বাদল দিনে...।
জুনের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মৌসুমী বায়ুর আগমনে বর্ষার আবির্ভাব। শ্রেষ্ঠ ঋতুকে স্বাগত জানাতে মনুষ্যকূল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। শীতের প্রকোপে লেপ কম্বলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে শীতের আমেজ উপভোগ করা যায়, বা বসন্তের মৃদুমন্দসমীরণে মনটা হয়তো উদাস হয়ে যায়। কিন্তু সে সবে তো প্রাণ বাঁচে না। বাঁচে না জীবকুলের প্রাণ। বাঁচতে গেলে অন্ন চাই,

এরপর ৪ পাতায়

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

এখন গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল

সেবক প্রতিবেদন: আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগটি এতদ্ অঞ্চলে খুব সুনামের সঙ্গেই পরিষেবা দিয়ে চলেছে। বেশিরভাগ ডাক্তারবাবুরা যাঁরা এই সেবায় সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা নিয়মিত সময়মত এসে রোগীদের দেখছেন।

হাসপাতালের দাঁতের বহির্বিভাগটিও এ অঞ্চলে বেশ সাড়া ফেলেছে। যেসব যুবক ডাক্তাররা এই কেন্দ্রে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা খুবই যত্ন সহকারে কাজ করছেন। তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়েছে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে।

গত জুন মাসে গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রায় ৩৩৩ জন রোগী পরিষেবা পেয়েছেন। দাঁতের বিভাগে প্রায় ৭৮ জন দাঁতের চিকিৎসা করিয়েছেন।

১লা জুলাই, ডাক্তার দিবস উপলক্ষে এই হাসপাতালে একটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। ডাঃ তাপস চট্টরাজ, ডাঃ বিশ্বনাথ ধর, ডাঃ দেবাশীষ গাঙ্গুলী, ডাঃ শৈবাল মৈত্র, ডাঃ বন্দনা পাল, এনাদের সহযোগীতা ও উৎসাহে ক্যাম্পটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়।

চক্ষুপরীক্ষা, শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মহিলা রোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা, থাইরয়েড, হিমোগ্লোবিন, লিপিড প্রোফাইল বিনামূল্যে পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০ জন রোগী এই ক্যাম্পে সামীল হয়েছিলেন। ইনার হুইল সংস্থার সদস্যারা এই ক্যাম্পে যোগদান করেন ও ডাক্তারবাবুদের কিছু উপহার দেন। গান্ধী সেবা সদনের তরফ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের পক্ষ থেকে এতদ্ অঞ্চলের মানুষদের ও সেবক পাঠক পাঠিকাদের আহ্বান করা হচ্ছে, হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসুন, খোঁজখবর নিন এবং নিয়মিত পরিষেবা গ্রহণ করুন। আপনাদের সেবার্থেই এই হাসপাতালের পথ চলা।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ নিয়ন্ত্রিত হাসপাতাল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে এখন থেকে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন:

১। গৌতম সাহা: **৯৪৩২০০০২৬০**
২। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য: **৯৮৩৬১৩৩৭৬২**
৩। সুব্রত পাল: **৯০৫১৪৬৬৯৩৮**
৪। জবা গুহঠাকুরতা: **৯৩৩১৮৯৮৬২৯**

এছাড়াও সরাসরি সঙ্ঘ অফিসে ফোন করতে:
(০৩৩) ২৫২১-৪০১১

শুরু হল কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্র

অবন সাহা

অধ্যাপক মলয় কুণ্ডুর উপস্থিতিতে সঙ্ঘের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন। ছবি: অবন সাহা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ বিগত প্রায় সাত দশক ধরে নিরলসভাবে সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বহু সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। বাস্তবায়িত হয়েছে বহু গঠনমূলক প্রকল্প। এই তালিকায় নতুন সংযোজন 'Gandhi Seva Shangha Computer Learning Center'. বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটারের ব্যবহারিক জ্ঞান শ্রেণী, জীবিকা ও বয়স নির্বিশেষে প্রায় সকল মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত ১৭ই জুলাই একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন হল এই শিক্ষা কেন্দ্রটির। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন Indian Statiscal Institute-এর অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী শ্রী মলয় কুণ্ডু। শিক্ষা কেন্দ্রটির জন্য দুটি কম্পিউটার সংগৃহিত হয়েছে I.S.I থেকে, এর জন্য আমরা শ্রী মলয় কুণ্ডু এবং অধ্যাপক শ্রী শুভঙ্কর মৈত্রর কাছে কৃতজ্ঞ। এখানে ব্যবহৃত অপর তিনটি কম্পিউটার ব্যক্তিগত অনুদান। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা, শ্রী জয়দীপ জানা এবং শ্রীমতি অঙ্কিতা বিশ্বাসকে। এই কেন্দ্রটি দ্বারা উপকৃত হবেন যেমন বয়স্ক মানুষেরা, এরই পাশাপাশি ছোটছোট ছেলে মেয়েরা ও স্কুল কলেজের পাঠক-পাঠিকারা। অতি স্বল্প মূল্যে প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ পাবে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বালক-বালিকা এবং তরুণ-তরুণীরা। সঙ্ঘের নতুন বিভাগ 'G.S.S.I.T' র সদস্য-সদস্যা এই প্রয়াসে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শ্রী প্রণয় রায়-এর নাম এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেবক পাঠক-পাঠিকা এবং জনসাধারণের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনারা যে কোন রকমের সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রটির ভবিষ্যত সুদৃঢ় করুন। ভবিষ্যতে বহু সাধারণ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবেন, এই আশা।

যোগাযোগ: অভীক ৯৩৩১০২৭৩৭৯
অবন ৯৮৩০৪৮৭২৫৭

পুনরায় শুরু হল পাঠচক্রের অনুষ্ঠান

উৎপল ঘোষ

প্রবীণ সদস্য/ সদস্যাদের স্মরনে আছে যে বিগত আশির দশকে সঙ্ঘ ভবনে নিয়মিত 'পাঠচক্র'-র আসর বসতো প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায়। পরিচালনা করতেন সাহিত্যিক সুশান্ত পাল। নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন সঙ্ঘের সাহিত্যরসিক সদস্যেরা। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রয়াত মাণিকবাবু, জ্ঞানবাবু, ভক্তিদি, সুনীল পাল, বিনয় ঘোষ, কানাইলালবাবু, অলক ঘোষ প্রমুখ। সমকালীন সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হত।

দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর ২০০৮-০৯ সালে গ্রন্থাগারের আহ্বায়ক শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এবং সক্রিয় সদস্য ধনঞ্জয় আঢ্যের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি পাঠচক্র তথা সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয় গ্রন্থাগারে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমিতাভ সমাজপতি, কবি কৃষ্ণা বসুর উপস্থিতিতে আলোচনা সভাগুলি আর্কষণীয় ছিল রসিক সদস্য ও তরুন-তরুনীদের কাছে।

সম্প্রতি সেই পাঠচক্রের আসর ধারাবাহিক পরিচালনার উদ্দেশ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, প্রতিমাসের শেষ রবিবার সন্ধ্যায় ৬-৩০টায় পাঠচক্রের অনুষ্ঠান গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হবে। সেইমত বিগত ২৬শে জুন, রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল পাঠচক্রের সভা। বিষয়বস্তু ছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে তাঁদের সৃষ্টি ও কীর্ত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান উদ্যোক্তা শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রী শিবেন্দু শেখর চক্রবর্ত্তী, ডঃ হিরন্ময় সাহা, উৎপল ঘোষ, জবা গুহঠাকুরতা, নীতিশ মুখার্জী, গৌতম সাহা ও গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকারা।

দ্বিতীয় পাঠচক্রের আলোচনায় আমাদের বিষয় ছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ কাদম্বিনী দেবীকে নতুন করে ফিরে দেখা। এরই সঙ্গে উঠে এসেছিল রজনীকান্ত সেনের নামও। আগামী আগস্ট মাসের শেষ রবিবারটি আবারও আমরা বসতে চলেছি।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের

www.gandhisevasangha.org

ওয়েব সাইট দেখুন

মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন

Sanjay Doshi 98310-05348
Aruna Doshi : 033 2534-0545

।। শ্রী ।।

SHREE OPTICAL

Family Opticians Since 2002

274, Canal Street, Sribhumi, Kolkata - 700 048
(Near Daffodil Nursing Home)

All major Debit / Credit Card Accepted
RAYBAN & VOGUE Frames Available Here

সঙ্ঘের গ্রন্থাগার

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের গ্রন্থাগারের সদস্য পদ গ্রহণ করুন। প্রতিদিন বিকেল ৫-৩০টা থেকে ৮-৩০টা পর্যন্ত এই গ্রন্থাগার খোলা থাকে। প্রায় ১০,০০০ বই-এর ভাণ্ডার এই গ্রন্থাগারে আছে। বই বাড়িতেও নেওয়া যায়। গ্রন্থাগারে বেশ কিছু মাসিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়।

বর্ষা ও ভারতের অর্থনীতি

বরুণ দেব ঘোষ

'বর্ষাকাল' এই ঋতুটির বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। অনেকে বর্ষাকাল ভীষণই পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো তাঁর ''সোনার তরী'' কবিতায় বর্ষার গুনগান করে গেছেন। আবার এমন অনেক মানুষ আছেন (যাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য) তাঁরা তো এই ঋতুটিকে বলা যায় একদমই পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে বর্ষা মানেই গুমোট করা গরম, ও কাদা প্যাচ-পেচে অবস্থা। এর কী প্রয়োজন? প্রয়োজন আছে। ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে, যে অর্থনীতি দাঁড়িয়ে কৃষির ওপর ভিত্তি করে, সেখানে বর্ষার প্রয়োজন আছে বৈকি? তাহলে তো কৃষকের আকুল আর্তি 'আল্ল ম্যাঘ দে, পানি দে' এই উক্তিটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। জলের অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হবে। ভারতের অর্থনীতির ওপর আসবে প্রবল আঘাত। কারণ গভীর নলকূপ, জলাধার ইত্যাদির স্বল্প-পরিমাণ জলে তো আর কৃষিকাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া জলের এই সকল উৎসগুলিতেই বা জল আসবে কী করে? বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রয়াত ভবতোষ দত্ত বলে গিয়েছিলেন যে, 'আমাদের দেশে যে ব্যাপক হারে রবিশষ্য, খারিফ শষ্য উৎপন্ন হয়, কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ করে এই কৃষিকাজ করা সম্ভব নয়। আর এই কৃষিভিত্তিক দেশে পরিকল্পনা মাফিক সেচ ব্যাবস্থা না করতে পারলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই তো বর্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। শুধু কি তাই, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর বর্ষা কৃষকের কাছে, গৃহস্থের কাছে, তথা আপামর মানুষের কাছে আশ্বাস ও স্বস্তি বয়ে আনে। আর আমরা বিশেষত এই ঋতুতে চাতক পাখির মত চেয়ে থাকি আকাশের দিকে, মেঘের দিকে, বর্ষার দিকে। ঋতুচক্রের নিয়ম অনুযায়ী আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস নিয়ে বর্ষাকাল হলেও বর্ষার আগমনের সঠিক কোন নিয়ম নেই। পরিবেশ দূষণের ফলে বর্ষা এখন হেমন্তকেও গ্রাস করেছে। প্রাকৃতিক এই অবস্থার বিষয়ে বিবেচনা করে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্ষার অতিরিক্ত জল বিভিন্ন জলাধারে মজুত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে শুখা মরশুমে সেই জল দিয়ে কৃষিকাজ করা যায়। এছাড়াও গভীর নলকূপ খনন, খাল খনন, ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু একটা কথা ভাবতে হবে যে, যত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন বর্ষা পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলে এই সকল ব্যবস্থা, পরিকল্পনা কোন কাজেই আসবে না। কৃষক ও কৃষিজীবিদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হবে। ভারতের অর্থনীতির ওপর যার আঘাত অপরিহার্য। এখন তো আবার বর্ষার ওপর জাতীয় অর্থনৈতিক সূচকের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। বর্ষার আবার নিজস্ব কিছু সৌন্দর্য্যও আছে। বর্ষা আনে গ্রীষ্মের তপ্ততার বুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস। বর্ষণ-সিক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তখন হয় নয়নাভিরাম, গ্রাম-প্রকৃতির দৃশ্য মনোরম হয়ে ওঠে। বর্ষার করুণা ধারায় মাঠ, ঘাঠ, পুকুর, নদী ভরে ওঠে। ধান-পাট-আখের চারাগুলি শ্যামলতায় সজীব হয়। নদ-নদীর কলধ্বনি, ঝিঁঝি ও ব্যাঙের ডাক, গুরু গুরু মেঘের গর্জন মানুষের মনকে অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে তোলে। বর্ষার প্রকৃতি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। কদম-কেতকী, যুঁই-দোপাটি, অপরাজিতা-হাস্নুহানার গন্ধে বর্ষা প্রকৃতিকে মাতোয়ারা করে দেয়। পরিমিত বর্ষা কৃষকের কর্মব্যস্ততাকে বাড়িয়ে দেয়। তারা তাদের সকল অলসতাকে ঝেড়ে ফেলে বিপুল উদ্যমে। কৃষিকাজে মনোনিবেশ করে ভাবী সোনালী ফসলের আশায়। অর্থনৈতিক ভাবে একটু স্বাবলম্বী হওয়ার ভরসায়। একটু সুখের মুখ দেখার স্বপ্নে তারা বিভোর হয়ে ওঠে। বর্ষার শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক দিকটি দেখলেই হবে না। এর আবার অন্য সামাজিক দিকও আছে। এই ঋতুতেই রথযাত্রা, স্নান যাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব ও বর্ষামঙ্গল উৎসবের সূচনা করেছিলেন। এছাড়া অম্বুবাচী, দশহারা, আষাঢ়-সংক্রান্তিকে ঘিরে মানুষের মনে নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সূচনা হয়। এই সময়ে মনসা পূজারও প্রচলন রয়েছে। অম্বুবাচীকে কেন্দ্র করে আসামের কামাক্ষা মন্দিরে চলে উৎসব। তাইতো যুগে যুগে কবি শিল্পীরা বর্ষার ছবি এঁকেছেন নানাভাবে। কেননা বর্ষা তো নতুন উদ্দীপনা নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রকৃতিকে তার রূপের ডালি উজার করে দেয়। বর্ষা সত্যি ঋতুকূল রানি-- সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎসবের আনন্দে মাঠভরা সোনালী ফসলের স্বপ্নে রৌদ্রতপ্ত বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যের পরে বর্ষার আগমন মানুষের জীবনে আনে প্রত্যাশা, আষাঢ়ের আকাশভরা মেঘে, কদমফুলের পূর্ণতায়, রঙবেরঙের ফুলের সমারোহে জীবনে পরম আশ্বাসবাণী বহন করে আনে বর্ষা।

বিধানচন্দ্র রায়

শঙ্করলাল ঘোষাল

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জন্মগ্রহন করেছিলেন, ১লা জুলাই, ১৮৮২ বিহারের পাটনার কাছে। বিধানচন্দ্র রায়ের মায়ের মৃত্যু হয় যখন তার ১৪ বছর বয়স। তার বাবাই সংসারের হাল ধরেন। পাঁচ ছেলের ভেতর বিধান রায় সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। যেহেতু তার বাবা এক্সাইস ইনস্পেকটর এর কাজ করতেন, তাই বাইরে থাকতে হত। তখন পাঁচ ভাইকেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করতে হত। ছোটবেলা থেকেই বিধান রায়ের নানান কাজকর্ম এবং অন্য লোকেদের সাহায্য করার অভ্যাস হয়ে যায়।

তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এলএ পাশ করেন ও পাটনা কলেজ থাকে বিএ পাশ করেন। গণিত নিয়ে বিএ পাশ করার পর তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এই দুই জায়গাতেই প্রবেশিকা পরিক্ষায় বসেছিলেন। দুই জায়গাতেই তিনি সাফল্য লাভ করেন।

১৯০১ সালে, কলকাতা মেডিকেল কলেজে তিনি ভর্তি হন। ডাক্তারি পরিক্ষার সময় প্রচন্ড আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হন। সৌভাগ্য ক্রমে একটি স্কলারশীপ পেয়েছিলেন। তাই দিয়ে তাঁর পড়াশুনার খরচা হয়ে যেত।

এই সময় চারিদিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তার মন এই আন্দোলন এর দিকে থাকলেও নিজেকে বুঝিয়ে ছিলেন জীবনের এই সময় লেখা পড়া করে তৈরি হওয়াটাই বেশি প্রয়োজন।

ডাক্তারি পাশ করে বিধান রায় প্রভিন্সিয়াল হেলথ সার্ভিস এ যোগ দেন ডাক্তার হিসেবে। অর্থ উপার্যনের জন্য প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং মেল নার্সিং এর কাজও করেন।

১৯০৯ সালে তিনি ইল্যান্ড যাত্রা শুরু করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষালাভ করার জন্য। তিনি St. Bartholomew's, Londan এ পড়াশুনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি এশিয়ান ছিলেন, তাঁর আবেদন নাকচ করা হয়। কিন্তু বিধান রায় ৩০ বার এই আবেদন জমা দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের মধ্যে মাত্র ২ বছর ৩ মাসের মধ্যে M.R.C.P. এবং F.R.C.S দুটো ডিগ্রিই পাশ করেন। এটি একটি রেকড-এর মধ্যে পরিগণিত হয়। ১৯১১ সালে দেশে ফিরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ এ শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। পরে ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজের ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেন। ছোটো বেলা থেকেই তার বাবার কাছ থেকেই তিনি সমাজ সেবার শিক্ষা পান। তাই ডাক্তার হিসেবেও সাধারণ মানুষের জন্য অনেক টাকা তিনি দান করেন এবং অনেক মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন Jadavpur TB Hospital, The R.G.Kar Medical Collage, The Chittaranjan Seva Sadan, The Chittaranjan Cancer Hospital, The Victoria Institution ইত্যাদি।

বিধানচন্দ্র রায় ১৯২৫ সালে রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি জনপ্রিয় প্রতিদ্বন্দী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে হারিয়ে Barracpore Constituency থেকে Bengal Legislative Council এর সদস্য হন। ১৯২৮ সালে তিনি An India Congress Committee তে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২৯ সালে Civil Disobediance Movemant এ বেঙ্গলের লিডার নিযুক্ত হন ও Congress working Committee র সদস্য হন। Congress Working Committee এর সদস্য হওয়ার পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর খুব ভাল বন্ধু হন।

১৯৪২-শে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। ওই বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। এই সময় জাপানিরা রেঙ্গুনে বোমা ফেলে। তারফলে কলকাতাতেও সেই প্রভাব পড়ে। বিধানবাবু মনে করতেন, কোনও অবস্থাতেই যেন শিক্ষার কোনও অসুবিধা না হয়। তাই তিনি স্পেশ্যাল এয়াররেডই শেল্টার তৈরি করান যাতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের কোনও অসুবিধা না হয়। তিনি দুর্গত মানুষদের জন্য অনেক ত্রান সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৪ সালে এই জন্য তিনি ডক্টরেট অব সায়েন্স ডিগ্রি পান।

বিধানচন্দ্র রায়ের নাম কংগ্রেস থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব আসে। কিন্তু বিধান রায় সহমত পোষণ করেনি। শেষ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে ১৯৪৮-এর ২৩শে জানুযারি তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন।

বিধানচন্দ্র রায়ের জনপ্রিয়তা কংগ্রেস পার্টিকেই সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১৪ বৎসরের সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের অনেক উন্নতি হয়েছে। একথাটা তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা যুব সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। তাঁদের নিজেদের তৈরি হওয়ার জন্যই। এবং ডাঃ রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার বিস্তার। সমাজে তাঁর অনেক অবদানের জন্য হায়েস্ট সিভিলিয়ন অ্যাওয়ার্ড 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয় ১৯৬১-র ৪ঠা ফেব্রুয়ারি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয় ১লা জুলাই ১৯৬২ সালে।

সেবক
২৯ শ্রাবণ ১৪২৩ রবিবার ● ১৪ আগস্ট ২০১৬

অগাস্টের ঋষি-কবি

ইংরেজি বর্ষের অষ্টম মাসটি অগাস্ট মাস। অগাস্টকে বাংলা করে বলতেই পারি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম উদ্রেককারী, মহামহিম, সুমহানের সমাবেশ। ১৮৭২ সালের ১৫ অগাস্ট কলকাতায় জন্মেছিলেন ঋষি অরবিন্দ। মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে ১৯২৬ সালের ১৫ অগাস্টে জন্মান কবি সুকান্ত। স্বাধীনতার হীনতায় না ভোগায় দ্বিতীয়বার আলিপুরে বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন শ্রীঅরবিন্দ। আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহের উপলব্ধি হয়। সে যে ব্রহ্মধ্যানের পুষ্পিত বৈভব। তখন আলিপুর মামলা সারা দেশে আলোড়ন ফেলেছিল। মামলা চালিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কারাগারে শ্রীঅরবিন্দের ভাবনায় এ উত্তরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে সমষ্টিকেন্দ্রিক 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়'-এ উত্তীর্ণ হয়। পরাধীন দেশের দুঃখ-দুর্দশাজনিত বেদনা এবং শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন; শোষিত মানুষের কর্মজীবন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য কবি সুকান্তের কবিতা স্বাধীনত্তোর যুগে হয়ে ওঠে উত্তাল প্রেরণা। 'ছাড়পত্র' বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের চেয়েও প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা পাঠক সমাজে অকুণ্ঠ প্রশংসা পয়েছিল। অনন্য স্থানে রয়েছে 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'মিঠে কড়া' শুধুই কবির প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়েই থাকেনি, থেকেছে সমাজসেবার 'সেবক' হয়েও।

বর্ষা তোমায় প্রণাম

১ পাতার পর

বস্ত্র চাই। আর সেসব দিতে পারে একমাত্র বর্ষা। বর্ষার বারিধারায় উৎপাদনশীলতা শুরু হয়। আর উৎপাদনের মাধ্যমে তো প্রাণ বাঁচে সভ্যতা বাঁচে। নদী নালা খাল বিল ভরে যায়। সমস্ত মলিনতা ধূয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। ধরিত্রী প্রবিত্র হয়।

বর্ষার যেমন জন হিতৈশি রূপ আছে। তেমনি আবার বর্ষা তার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ধেয়ে এসে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়, অসংখ্য ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। বর্ষার সেই ভয়ঙ্কর রূপ থেকে বাঁচতে মানুষ কি প্রাণন্তকর প্রচেষ্টা চালায়।

মনটা সেই সুদূর অতীতের দিকে চলে যায়। সময়টা ষাট দশকের শেষ ভাগ, বি কম পরীক্ষা দিয়ে আমার এক দিদির সঙ্গে তার বাড়ি মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলাম। তখন সময়টা মে-জুন হবে। সন্ধ্যার আলো অন্ধকারে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলাম। দুপাশের ধান ক্ষেতের মাঠ সূর্যের খরতাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

সেই দিন রাত্রে বর্ষার ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পৃথিবী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে লাগলো। অনেক কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়লো। অনেকেই আশ্রয়হীন হলো। আমার বেশ মনে আছে অনেক লোকই দিদির বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। দিদির বাড়িটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। মাটির দোতলা বাড়ি।

পরের দিন সকালে বর্ষার রুদ্ররূপ শান্ত হলো। একটু বেরিয়ে দেখি চর্তুদিকে জলে জলময়। যে মেঠো পথ দিয়ে গতকাল এসেছিলাম তার চিহ্ন মাত্র নেই। সর্বত্রই জল মগ্ন।

এমন সময় সংবাদ এলো কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে এবং বন্যার জল প্রবল বেগেই গ্রামের দিকে ছুটে আসছে। দিদির শ্বশুরমশায় চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, আমি তো হতভম্ব। এমন কথা তো কোন দিন শুনিনি। শুনলাম বন্যার জল এসে সমগ্র অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষের বাঁচার আশা ক্ষীণমাত্র। সবাই ডুকরে কাঁদছে। মৃত্যুর সেই হাতছানি আমার মনে তেমন দাগ কাটেনি। কেন না আমার তো কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। খবরের কাগজে বন্যার সেই ভয়াবহ রূপের বর্ণনা পড়েছি।

সবার মধ্যে একটা ব্যস্ততা এলো বন্যার জল আসার আগে প্রত্যেকে বাড়ির চালের মাথায় উঠতে হবে। অবশ্য খড়ের চাল ছিল। তড়িঘড়ি রান্না চাপিয়ে দেওয়া হলো। মুড়ি ইত্যাদি যা বাড়িতে ছিলো ব্যাগে ভর্তি করা হলো। জামা কাপড়ের বান্ডিলও করা হলো। ক'দিন ওইভাবে থাকতে হবে কেউ জানে না। সেই সময় সেই বাড়িতে আমাকে অবাঞ্ছিত বলে মনে হচ্ছিল। একটা বাড়তি লোকের বোঝা তাদের উপর চেপে বসেছিল। কারণ আমার নিজের দিদি তো নয়।

কিন্তু না ঈশ্বর সদয় হলেন। বাঁধ ভাঙেঁনি কয়েকটা ফাটল দেখা দিয়েছে মাত্র। গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় তা মেরামত করা গিয়েছে। কয়েক দিন পর সেখান থেকে ফেরার পথে দীঘা সড়কের দুধারে তাকিয়ে বর্ষার ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সমস্ত অঞ্চল তখনও জলমগ্ন দীঘা সড়কও ডুবে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে জল সরে যাওয়ায় চলাচলের উপযুক্ত হলো। দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম তখনও অনেক বাড়ি জলমগ্ন। অনেক গাছ উপরে গিয়েছে। এক রাত্রের বৃষ্টিতে বর্ষার সেই ভয়ঙ্কর রূপ আজও পরিষ্কার মনে পড়ে।

কিন্তু না, বর্ষার ভয়ঙ্কর রূপ বর্ষার মাতৃরূপের কাছে হার মেনে যায়। বর্ষা আমাদের প্রাণ বাঁচায়। আমাদের সভ্যতা বাঁচায়। আমাদের কৃষ্টি বাঁচায়।

হে বর্ষা তোমাকে প্রণাম।

বৈদিক গণিতশাস্ত্র

শঙ্করলাল ঘোষাল

আজকে বৈদিক গণিতশাস্ত্রের একটি বিস্ময়কর অবদান বেস প্রণালী (Base Method) যার দ্বারা গুণফল সহজেই করা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আমরা নিম্নলিখিত গুণগুলো করব

(১) 97 x99 (২) 9989 x9995 (৩) 9999999 x9999999

ক) প্রথমে আমাদের জানতে হবে এখানে Base কি ? Base হচ্ছে 10 এর power অর্থাৎ 10, 100, 1000, 10,000, 1,00000 ইত্যাদি।

খ) এবার, যেই সংখ্যাগুলো দিয়ে গুন করছি তার কাছাকাছি 10 এর power নিতে হবে। যেমন, (১) নং উদাহরণে বেস হবে 100, (২) নং এ হবে 10,000 আর (৩) নং এ হবে 1,00,00,000।

গ) এবার প্রতিটি সংখ্যার থেকে বেসের যেটা difference সেটা বার করলে হবে--

(১) 100	(২) 10,000	(৩) 1,00,00,000
97-3	9989-11	9999999-1
99-1	9995- 5	9999999-1
---	---	---

ঘ) আমরা কিছু না করে বলতে পারি গুণ ফলের ডানদিকের (RHS) সংখ্যা বেসের '0' এর সংখ্যার সমান হবে।

যেমন নিম্নরূপ--

(১) 100	(২) 10,000	(৩) 1,00,00,000
97-3	9989-11	9999999-1
99-1	9995- 5	9999999-1
---	---	---
।--	।----	।------ -
RHS	RHS	RHS

ঙ) এবার বেস থেকে যে difference গুলো বেরিয়েছে সে গুলো গুণ করে গুণফল ডানদিকে RHS এ বসিয়ে দিতে হবে। কোনো সংখ্যার ঘর খালি থাকলে '0' বসাতে হবে।

যেমন নিম্নরূপ--

(১) 100	(২) 10,000	(৩) 1,00,00,000
97-3	9989-11	9999999-1
99-1	9995- 05	9999999-1
---	---	---
।03	।0055	।0000001

চ) এবার আমরা শেষ ধাপে যাই। অর্থাৎ বাঁদিক (LHS) বার করতে হবে। (১) এ আমরা যদি gross বিয়োগ করি আমরা পাই (97-1) 96 এবং (99-3) 96। (২) এ ও উভয়ক্ষেত্রেই আমরা 9984 পাই। যেমন, 9989-5= 9984, 9995-11=9984। উদাহরণ (৩) এ উভয়ক্ষেত্রেই 1 বিয়োগ করে সংখ্যাটি হয় 9999998।

সুতরাং গুণফল হল

(১) 100	(২) 10,000	(৩) 1,00,00,000
97-3	9989-11	9999999-1
99-1	9995- 5	9999999-1
---	---	---
96 ।03	9984 ।0055	9999998 ।0000001
9603	99840055	99999980000001

আপনাদের মনে হতে পারে প্রণালিটা অনেক বড়ো। একদম নয়। বিশদ বিবরন দিয়ে বলা হল যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। আপনাদের উপরোক্ত প্রণালি জানা হয়ে গেলে দেখবেন যে গুন করতে বহু সময় ও কষ্ট সাধ্য হবে, তা এক থেকে পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনারা করতে পারবেন। বিশেষত competitive examination এ

খুব সুবিধে হবে। ধরুন কোনো গুণফলের চারটে alternative থেকে আসল গুণফলটা বেছে নিতে হবে। তাহলে দেখবেন ডানদিকের গুণফল (RHS) বেড়িয়ে গেলেই আসল গুণফলটা বের করতে পারবেন। বাঁদিকের গুণফল (LHS) আর বার করতেই হবে না।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের আংশিক অন্তর্বিভাগ শুরু হতে চলেছে আগামী ২রা অক্টোবর

আপনি কি জানেন ?

দেবাশিস ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক তথ্য-১ (৩ জুলাই, ২০১৬)

ক্ষুধার বিশ্বে

- বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা - ৭,২৭৯,৮০৬,৩৭৬
- অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা - ৮৮৫,৪৮৮,৭৬৯
- ভারী ওজনের মানুষের সংখ্যা - ১,৬০০,৯১৫,১০৩
- মেদবহুল মানুষের সংখ্যা - ৫৩৩,৬৩৮,৩৬৮
- দৈনিক অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা - ৫,৫৭৩
- বিগত এক বছরে অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা - ১০,৪৮৩,৫৭৭

অর্থনীতি (মার্কিন ডলারে)

- আমেরিকায় একদিনে মেদ বৃদ্ধিজনিত রোগের খরচ - ৮৬,৭১৬,০২১
- মার্কিন পরিবারগুলির একদিনে কিনে ফেলে দেওয়া খাদ্যের খরচ - ২১,৪২৭,৫৬৩
- বিশ্বে একদিনের খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ - ৯৯৬,৩৩৮
- আজ একদিনের অনাহারীদের খাওয়ানোর খরচ - ৬,৪৭৭,৭৭২
- আমেরিকায় আজ একদিনে ওজন কমানোর চিকিৎসা/ঔষুধের খরচ - ৮৮,৫৩৫,১৭১
- আজ একদিনে চারটি বৃহৎ আমেরিকান কৃষি ব্যবসায় কর্পোরেশন থেকে খাদ্য সহায়ক কর্মসূচীতে অর্জিত রাজস্ব - ১,৩২৬,২১৩
- ইয়োরোপ ও আমেরিকায় পোষা প্রাণীদের একদিনের খাওয়ার খরচ - ৮,৪৭২,০২০

খাদ্য (টন)

- একদিনে আমেরিকার খাদ্য অপচয় - ২৩,৯১৮
- বিশ্বে একদিনের খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ - ৪,৯৮৩
- একদিনে ইয়োরোপ/উঃ আমেরিকায় পশুদের খাওয়ানো গোলাজাত শস্য, দানা, সয়াবীনের পরিমান - ৮০ শতাংশ।
- খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশগুলিতে অপুষ্টিতে ভোগা শিশু - ৭৮ শতাংশ।
- ধনী দেশগুলিতে মোট খাদ্য রপ্তানিকারক - ৯০ শতাংশ

বিশ্বের ক্ষুধার্ততম দেশগুলি (36 out of 40)--৯০ শতাংশ [সুত্র: স্টপ দি হাঙ্গার ডট কম]

সাম্প্রতিক তথ্য - ২

বিশ্ব ক্ষুধা

- সারা বিশ্বে ১০২ কোটি মানুষের যথেষ্ট খাবার নেই, যা নাকি আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপীয়ন ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশী।
- বয়স্ক এবং শিশু মিলিয়ে দৈনিক ক্ষুধা এবং তজ্জনিত কারনে মৃত্যু সংখ্যা - ২৫০০০
- এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলেই বিশ্ব জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর এবং বিশ্ব ক্ষুধার্ত জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে।
- ৬০ শতাংশের উপর ধারাবাহিক ক্ষুধার্তরা নারী।
- বিশ্বে ক্ষুধার্তদের ৬৫ শতাংশ মানুষই বাস করেন মাত্র ৭টি দেশে - ভারত, চীন, কঙ্গো, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া।
- শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৯০ কোটি ৭০ লক্ষ। [সুত্র: FAO]

শিশু ক্ষুধা

- ক্ষুধা এবং তজ্জনিত রোগে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। [সুত্র: FAO]
- বিশ্বে ৫ বছরের নীচের ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কম ওজনের শিশুদের ৭০ শতাংশ থেকে মাত্র ১০টি দেশে যার ৫০ শতাংশ বাস করে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায়।
- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৫ বছরের কম বয়স্ক ১কোটি ৯০ লক্ষ শিশু প্রতি বছর মারা যায়। অপুষ্টি এবং ক্ষুধাজনিত রোগ এর মধ্যে ৬০ শতাংশের মৃত্যুর কারণ।
- প্রতি ৪ জন শিশুর মধ্যে একজন - যা মোট প্রায় ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ উন্নয়নশীল দেশের শিশুর ওজন স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম।

অপুষ্টি

- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৫ বছরের কম বয়স্ক শিশু মৃত্যুর ৫৩ শতাংশই অপুষ্টির কারণে।
- ভিটামিন A-র অভাবে বছরে ১০ - ৩০ লক্ষ শিশু মারা যায়।
- উন্নত দেশগুলিতে আয়রনের অভাব জনিত কারণে মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে ৪০ - ৬০ শতাংশ শিশুর। [সুত্র: UNICEF]
- অপুষ্টির প্রধাণতম কারন শরীরে আয়রনের অভাব যার দরুন ২০০ কোটি মানুষ আক্রান্ত। শুধু আয়রনের অভাব দূর করতে পারলেই জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা ২০ শতাংশের উপর বৃদ্ধি পেতে পারে। [সুত্র: WHO]

বিশ্ব ক্ষুধা তথ্য - ফল/কারণ - দুয়েকটি মন্তব্য।

- এ বছর পাঁচ বছরের নীচে প্রায় ৯০ লক্ষ শিশুর অকারণ মৃত্যু ঘটবে - যার মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর মৃত্যুর কারণ হবে ক্ষুধা জনিত।
- উন্নয়নশীল দেশগুলির ১.৪ বিলিয়ন মানুষ বর্তমানে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে - যাদের দৈনিক আয় ১.২৫ মার্কিন ডলারের কম।
- অর্থনীতিগত ভাবে, দরিদ্র মানুষদের খাদ্য সংগ্রহের পিছনে মূল্যবান সময়/শক্তির অধিকতর ব্যয় করতে হয়, ফলত, কর্মে এবং উপার্জনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সময়/শক্তি কম থাকে।
- অপুষ্টি মানুষের স্বাস্থ্য, উৎপাদন ক্ষমতা উদ্যম এবং সুস্থতা কে আঘাত করে। সে কারনে, মানুষের চিন্তাশক্তি, বৃদ্ধি, শক্তিহ্রাস, ভ্রূনস্বাস্থ্য হানি, মানসিক দুর্বলতার আঘাত সহ্য করতে হয়। [সুত্র: স্টপ দি হাঙ্গার ডট কম]

আসুন আমরা একটু ভাবি - এ কেমনতরো উন্নয়নের পথে মানব জাতি এগিয়ে চলেছে? কোন ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আমরা?

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

পরিচালিত
ক্যানসার রোগী ও সাথীর জন্য
অতি অল্প খরচে নির্ভয়ে
সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ সেবা নিবাস

গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস. কে. দেব রোড, শ্রীভূমি, কোলকাতা-৪৮
শ্রীভূমি পোস্ট অফিসের পাশে

পথনির্দেশ

বাস - আর জি কর হাসপাতাল থেকে - 30C, 215/1, 211A
নিলরতন হাসপাতাল, শিয়ালদহ থেকে - 221. 223, 44, 45
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে - 46, 12C/1, 46,
বিরাটি-বাগুইআটি-এয়ারপোর্ট মিনি
লেকটাউন ভি. আই. পি. রোড মোড় স্টপেজ

প্রয়োজনে যোগাযোগ গান্ধী সেবা সঙ্ঘ (033) 25214011
দীপা দত্ত: 9007833036, অপূর্ব কুন্ডু: 9593576084
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য: 9836133762 গৌতম সাহা: 9432000260

বর্ষা যখন বাঙ্ময়

১ পাতার পর

বর্ষার অলস অবাধ সময়ের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারই হল বইপড়া। বর্ষার কবিতা পাঠ কিংবা বর্ষার গান শোনা। কুঁড়ের বাদশা বাঙালির শুধু অজুহাত চাই একটু পিঁটির পিঁটির ইলশে গুঁড়ির। খিচুড়ি ইলিশ ভাজা যদি একটু মহার্ঘ হয় অধুনার বঙ্গজীবনে নিদেন পক্ষে দ্বিজেন-এর চায়ের দোকানে পেঁয়াজি ফুলুরির কড়াটা তো বসিয়ে দিতে পারে আড্ডাজনদের মুখরঞ্জনে। তেলেভেজা সমবেত কণ্ঠস্বরে 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' গাওয়ার অনুভূতিই যে অপার্থিব।

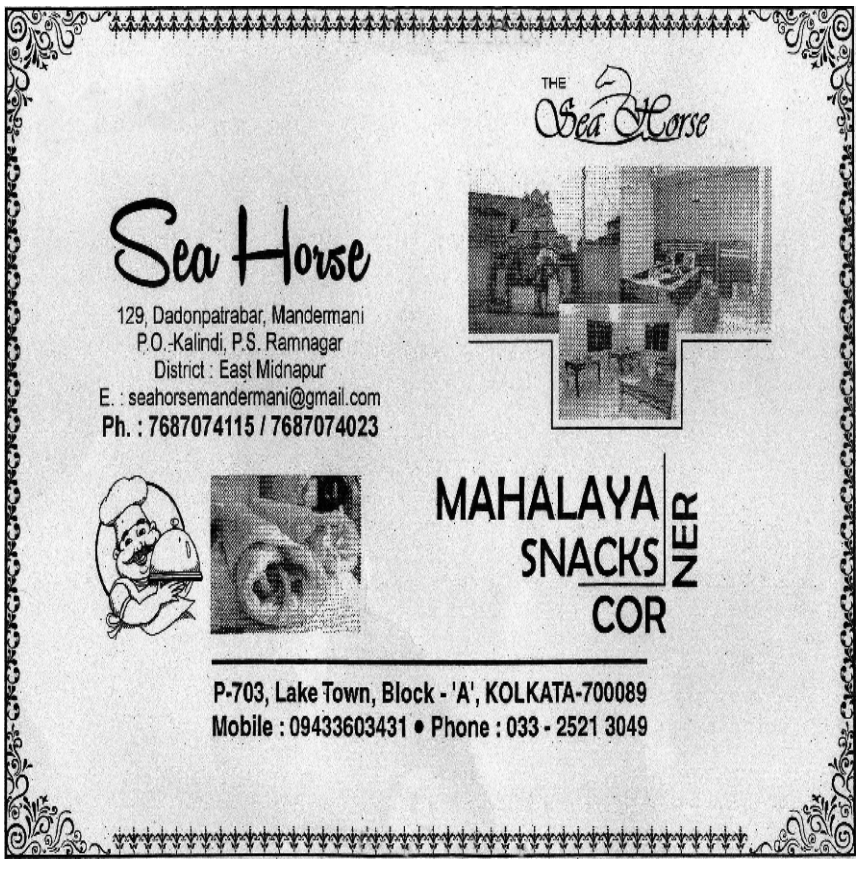

রেনে লেনেক এবং স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার

দীপা দত্ত

ডাক্তারবাবু আসছেন। বলতেই চোখে ভাসে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে রাখা একজন মানুষকে। এই যন্ত্র ছাড়া ডাক্তারের কথা কি সত্যিই ভাবা যায়! গলায় ঝোলা স্টেথোস্কোপই একজন ডাক্তারকে চেনার সবচেয়ে সহজ এবং প্রচলিত উপায়।

আসলে 'ইমিডিয়েট অস্কালটেশন'। মানব দেহের অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনার প্রক্রিয়া। কিন্তু উনিশশো শতাব্দীতে ওই স্টেথোস্কোপ ছাড়াই ডাক্তারকে রোগীর হৃদস্পন্দনের হিসেব কষতে হতো মূলত হাত দিয়ে নাড়ি অনুভব করে বা বুকে কান পেতে হৃদস্পন্দন শুনে ডাক্তারকে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। যে কোনও মানুষের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব ছিল নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ওই প্রক্রিয়া।

১৮১৬ সালে ফরাসি ডাক্তার রেনে থিওফাইল হায়াসিন্থে লেনেক (Rene Theophile Hyacinthe Laennec, দুঃখিত, আপনি কি ভাবে উচ্চারণ করবেন, ভেবে নিন), এক রোগীর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। রোগী অত্যোধিক স্থূল হওয়ায় রেনে হাত দিয়ে তার নাড়ি পরীক্ষা করতে পারছিলেন না। আবার রোগী একজন তরুণী বলে রেনে বুকে কান পেতেও পরীক্ষাটি করতে পারছিলেন না। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি তখন থেকেই শব্দ বিজ্ঞানের আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেন। প্রায় আপেল গাছের নিচে বসে থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারকের আবস্থা। সালটা ১৮১৬, সেপ্টেম্বর মাস। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সকালে ল্যুভর প্রাসাদের উঠোন দিয়ে হাঁটার সময় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী রেনে দেখেন দুটি স্কুল পড়ুয়া শিশু একটা লম্বা আর ফাঁপা কাঠ নিয়ে খেলা করছে। ছোটছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে তাঁর বেশ ভালই লাগত। একজন একপ্রান্তে একটা পেরেক দিয়ে আঁচড় কাটছে আর অন্যজন আরেক প্রান্তে তা কান লাগিয়ে শুনছে। বিজ্ঞানটা তখনই রেনের মাথায় খেলে যায়। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওই বাচ্চাদের একজনকে অনুরোধ করে নিজেই একপ্রান্তে কান রাখেন। পরিষ্কার শুনতে পান কাঠটি আঁচড়ের শব্দকে অ্যাম্পলিফাই করে অপর প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে।

চলে আসেন তাঁর চেম্বারে। তিনি একগোছা কাগজ রোল করে চোঙের মতো বানিয়ে ফেলেন। এবং প্রথম দেখাতে আসা রোগীর বুকের একদিকে একপ্রান্ত রেখে অপর দিকটি নিজের কানে লাগান। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, এতে করে হৃদস্পন্দন যতটা স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে অন্য রোগীর বুকের ওপর সরাসরি কান পেতেও ততটা স্পষ্ট শোনা কখনও যায়নি। কারণ বায়ু মাধ্যমের চেয়ে কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ বেশি। আর এই যে বুকের ওপর সরাসরি কান না পেতে বা হাত দিয়ে স্পর্শ না করে, মাঝখানে একটা মিডিয়া ব্যবহার করে হৃদস্পন্দন শোনার প্রক্রিয়া করেছিলেন তাকেই বলে (Mediate Auscaltation) মেডিয়েট অস্কাল্টেশন।

রেনের তৈরি প্রথন স্টেথোস্কোপটি ছিল ২৫ সেমি লম্বা আর ২.৫ সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট কাঠের ফাঁপা চোঙ। পরে তিনি তিনটি আলাদা টুকরোয় ভাগ করেন এই যন্ত্রকে। এই যন্ত্রের নাম রেনে স্টেথোস্কোপ রেখেছিলেন কারণ Stethos মানে বুক এবং Skopos মানে অনুসন্ধান। তবে এও শোনা যায় ওই সময়ে সেই যন্ত্রটিকে তখনকার সব চিকিৎসক সমাজ খুব একটা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেননি।

যে ব্যক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন বিপ্লব এনে দিলেন তার জীবন সম্পর্কে কিছু না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর উপরি হল তাঁর জীবন খুবই ঘটনা বহুল। পড়তে ভালোই লাগে। বিরক্ত লাগলে পড়া বন্ধ করে দেবেন।

রেনে লেনেক ১৭৮১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, ফ্রান্সের কুইম্পারে জন্মগ্রহণ করেন। রেনে যখন মাত্র পাঁচ বছরের শিশু তাঁর মা 'মিশেল ফেলিচিতে লেনেক' মারা যান। পেশায় আইজীবী খরচে দুর্নাম কুড়ানো বাবা 'থিওফাইল মারি লেনেক' তার দুই ছেলের দেখাশোনা করতে অপারগ ছিলেন। ফলে রেনে তাঁর গ্রান্ড অঙ্কল (বাবার কাকা)-র কাছে চলে যান।

ছোটবেলায় রেনের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল তিনি অবসন্নতায় ভুগতেন আর মাঝেমাঝে অনেকদিনের জন্য তার জ্বর আসতো। ধারণা করা হয় তাঁর হাঁপানিও ছিল ভগ্ন স্বাস্থের কারণে। বিষণ্ণতায় ভুগলেও তিনি সঙ্গীতের মধ্যে মানসিক শান্তি খুঁজে পেতেন। তার অবসর সময় কাটত বাঁশি বাজিয়ে কিংবা কবিতা লিখে। বাঁশের বাঁশি বাজাতে নাকি রেনে ওস্তাদ ছিলেন। গ্র্যান্ড আঙ্কলের কাছে কয়েক বছর থাকার পর ১৭৯৩ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় বারো বছর বয়সে রেনে পশ্চিম ফ্রান্সের নঁত (Nantes) শহরে যান। তাঁর কাকা ডাঃ গুইলাউমে লেনেক সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলেন। বিপ্লবের উত্তাল সময়েও রেনে কাকার বাড়িতে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজি ও জার্মান ভাষা রপ্ত করেন ও অনেক পুরস্কারও জেতেন। ডাঃ গুইলাউমে তাঁকে ডাক্তারি পড়তে উৎসাহ দেন। রেনেও কাকার অধীনে ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। ১৭৯৫ সালে, মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে নঁত শহরের হোটেল ডিউতে অবস্থানরত অসুস্থ এবং আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের সেবা করতে শুরু করেন। ১৭৯৯ সালে, আঠারো বছর বয়সে হোটেল ডিউতেই তিনি তৃতীয় শ্রেণীর সার্জন হিসেবে চাকরি শুরু করেন।

রেনে ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী একজন ছাত্র। তিনি অনেকগুলি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি প্যারিসে অবস্থিত 'ইকোল প্রাতিক' নামক প্রতিষ্ঠানে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শেখার জন্য ভর্তি হন। রেনের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত গুইলম ডুপইট্রিন (Guillaume Dupuytren), সম্রাট নেপোলিয়ানের ব্যক্তগত চিকিৎসক নিকোলাস মারেস্ট (Nicolas Marest) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় (১৮০১) রেনে মেডিসিন এবং সার্জারি উভয় বিষয়েই প্রথম হন। ১৮০২ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং ১৮০৪ সালে ডাক্তারি পাশ করেন।

পারিবারিক পরিস্থিতি, যক্ষ্মায় ভুগে ডাক্তার কাকার মৃত্যু, গুইলম ডুপইট্রিন-এর অধীন থেকে বেরিয়ে আসা, আর্থিক টানাপোড়েন সৃষ্টি ইত্যাদি নেতিবাচক ঘটনা রেনের কাজের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করে দেয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হওয়ার আশায় তিনি ব্রিটানি নামক অঞ্চলের গ্রাম্য এলাকায় চলে যান, সেখানকার জলবায়ু তাকে তখনকার মতো সুস্থ করে তোলে।

জীবনে এত প্রাপ্তি ও সফলতা সত্ত্বেও রেনের মস্ত এক আক্ষেপ ছিল প্যারিসের কোনও বড় হাসপাতালে তিনি চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১৮১৬ সালে প্যারিসের নেক্টার হাসপাতালে তিনি নিয়োগ পান এবং খুশি মনেই সেখানে যোগ দেন। এখানে আসার পর তিনি এই বৈপ্লবিক আবিষ্কারটি করেন। এরপর তাঁর জীবনে একটার এপর একটা সাফল্য আসতে থাকে। রেনেকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল অস্কাল্টেশনের জনক। তিনি সর্বপ্রথম নিজের আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনে ব্রনকিকট্যাসিস, যকৃৎ সিরোসিস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এছাড়া তিনি স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ যেমন-- নিউমোনিয়া, টিবি, ব্রনকাইটিস্, প্লুরেসি, এমফাইসেমা, নিউমোথোরাক্স ইত্যাদির শ্রেণীবিভাগ করেন।

তিনি ১৮২৪ সালে ৪৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন মিস আর্গনকে। এরপর ক্রমশ রেনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ধরা পড়ে যে তাঁরও যক্ষ্মা হয়েছে। সে সময় 'যার হয় যক্ষ্মা তার নেই রক্ষা'। ১৮২৬ সালের মে মাসে রেনের জ্বর ও কাশি ও শ্বাসকষ্ট চরম আকার ধারণ করে। তিনি সুস্থ হওয়ার আশায় ব্রিটানির সেই গ্রামে আবার ফিরে আসেন। ব্রিটানির আবহাওয়া তাকে সামান্য উজ্জীবিত করলেও পুরোপুরি সুস্থ করতে পারেনি। ব্রিটানিতে যাওয়ার চার মাস পরে ১৮২৬ সালের আগস্টের ১৩ তারিখে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নিজের শেষ দিনগুলোতে রেনে তার ভাগ্নে 'মেরিয়াদেক'-কে বলেছিলেন স্টেথোস্কোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে এবং সে কি শুনছে সেটা বলতে। মেরিয়াদেক যখন কাজটি করলেন, তখন রেনে খুব সহজেই বুঝতে পারলেন শব্দের নির্দিষ্ট প্রকৃতিটি। তিনি এই প্যাটার্নের শব্দ বহুবার বহু রোগীর বুকে. শুনেছেন। আর এই শব্দের ধরণ দেখে তিনি বুঝে গেলেন তাঁর অবিষ্কৃত যন্ত্র বলছে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত And the Irony is... যন্ত্র বলছে আবিষ্কারকের যক্ষ্মা হয়েছে। রেনে লেনেক ও মিস আর্গন ছিলেন নিঃসন্তান, তিনি তাঁর সবকিছুই মেরিয়াদেক-কে দিয়ে গিয়েছিলেন। সর্বোপরি সেই স্টেথোস্কোপক যাকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন -- The greatest Legacy of my Life।

AGNI

AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.

An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company

Leader in Solar PV Engineering

MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner

HEAD OFFICE:

114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে এবং গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের তহবিলে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে:

১। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	৬০০০ টাকা
২। রসময় চক্রবর্তী	৫০০০ টাকা
৩। রেখা রায়চৌধুরি	৫০০০ টাকা
৪। সমদর্শী ফাউন্ডেশন	৫০০০ টাকা
৫। মঞ্জরী মিত্র	২০০০ টাকা
৬। আশুতোষ ঘোষ	১০০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের স্পর্শে রজনীকান্ত সেন

নীতিশ মুখার্জি

মাসের শেষের রবিবারটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেই মাসে জন্ম-মৃত্যু নির্বিশেষে বিশিষ্ট, সমাজে স্বীকৃত, সর্বজন বিদিত মনীষীদের নিয়ে আমরা পাঠচক্রে বসবো গান্ধী সেবা সঙ্ঘের লাইব্রেরিতে। তাঁদের স্মরণ করার পাশাপাশি শ্রদ্ধা নিবেদন করার এ এক পথ চলা শুরু হল মাত্র। এই পরিক্রমার দ্বিতীয় আসরে আমরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ কাদম্বিনী দেবীকে স্মরণ করেছিলাম। কথায় কথায় উঠে এসেছিল রজনীকান্ত সেনের নামও। জন্ম-মাস ছিল। আলোচনার শেষে রজনীকান্তের সেই গানটি, 'তুমি অরূপ স্বরূপ/স্বগুণ নির্গুণ... আমাদের অনুজ শ্রীমান অবন সাহার সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশকে আবেগঘন করে তোলে।

কণ্ঠরোধ হয়ে যাওয়া রজনীকান্তের শেষের দিকে তাঁর 'দয়াল'-এর প্রতি যে নিবিড় আকুতি, একবার চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষার শেষপর্বটাই তুলে ধরলাম এখানে।

অত্যন্ত সাদামাটা জীবন ও পরিবেশে সাহিত্য-সঙ্গীত সাধনায় রজনীকান্ত সেন রাজশাহীর ভাঙাবাড়ির পিছিয়ে পড়া গ্রাম ও সাধারণ মানুষের মধ্যেই নিজের অনুভবের ব্যাকুলতাকে দেশীয় ভঙ্গিতে হাটে-বাজারে, বন্ধু মহলে প্রচার করে নিজেতে মুগ্ধ, বর্ধিত ও তাঁর অবস্থিতিতে আবদ্ধ ছিলেন। রাজশাহী কোর্টের ওকালতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সাধারণ মানুষজনের নিত্যদিনের সান্নিধ্যের মধ্যেই প্রধানত নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন রজনীকান্ত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি, তাঁর সঙ্গীত, তাঁর সাহিত্য-আদর্শ এবং জীবন সম্পর্কের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নানাভাবে সংগ্রহের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ মূর্তি আপন অন্তরে ধরে রেখে রজনীকান্ত এগিয়ে চলেছিলেন। মাঝে মাঝে শিক্ষাগ্রহণ বা অন্য কোনও কাজে কলকাতায় যেতে হলেও রবীন্দ্রনাথের পরশ, তাঁর দর্শন সম্পূর্ণ রজনীকান্তের কাছে দূরঅস্ত ছিল। বন্ধু-বান্ধব তথা কলকাতার সাথে নিত্যযুক্ত মানুষদের কাছ থেকে যা পাওয়া যেত তাতেই রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে আপন মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জীবনের অতি গভীর মুহূর্তের অবকাশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের দেখা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার কিছু কিছু রজনীকান্ত শুনেছেন নানাভাবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করার সুযোগ তাঁর পক্ষে তেমন সহজ উপায় ছিল না আপন কর্মক্ষেত্র রাজশাহী হওয়ায়। সেখানে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগে যাঁরা আসতেন তাঁরা মাঝেমাঝে সাহিত্য মজলিস করতেন -- সেখানে গান, কবিতা-পাঠ, প্রবন্ধ, রাজনীতির হালহকিকৎ সহ নানা উত্তরণের কথা আলোচনা হত। সেই মজলিসে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা একটা নিত্য সূচী ছিল। রজনীকান্ত গানের মধ্য দিয়ে সুরারোপ করে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতেন-- নিজের জীবনের নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে আনন্দ পেতেন।

তখন প্রায় সর্বত্র প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' (১৩০০)। রজনীকান্তও তা কণ্ঠস্থ করেছেন। ১৩০১ সাল। বড়দিনের ছুটিতে রাজশাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্র একটি স্থানীয় ডিঙ্গি নৌকায় করে কলকাতায় যাবেন-- সব ঠিকঠাক-- এমনি সময় রজনীকান্ত পারে এসে অক্ষয় মৈত্রকে বললেন, 'দাদা, ঠাঁই আছে?' অক্ষয়বাবু

রজনীকান্তের দিকে তাকালেন-- তাঁর মনে পড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের সেই লাইন-- ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরী--

স্মিত হাসিতে অক্ষয়বাবু তা না বলে রজনীকান্তকে আশ্বস্ত করে বললেন, ভয় নাই, নির্ভয়ে আসতে পার। আমি ধানের ব্যবসায়ী নই।

কলকাতায় পৌঁছবার পর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অক্ষয় মৈত্র রজনীকান্তকে সঙ্গে করে বোলপুরে গেলেন। রজনীকান্তের সে কী আনন্দ! বহুদিনের বহু প্রতীক্ষিত কবিবর, দেশবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে বোলপুর শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছেন!

সেখানেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলেন। সমস্ত মন প্রাণ যুক্ত করে দেহের প্রতিটি স্পন্দনে শিহরণের তরঙ্গ খেলে গিয়েছিল যেন! এরপর দুটি গান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে- লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ/নীল গগন-গর্ভে;/তীব্রবেগে ভিম মূর্তি/ভ্রমিছে মত্ত গর্বে।... দ্বিতীয়টি: স্তূপিকৃত, গগন-রহিত/ধূলি, সিন্ধুকূলে,/কোটি কোটি করিছে বাস,/এক সূক্ষ্ম ধুলে/কীটদেহ জনম-মৃত্যু... প্রীতি ভীতি সখ্য।... গান দুটি কোথায় প্রকাশিত, আমরা শুনতে চাই, পড়তে চাই... হঠাৎ জনতার উচ্চকিত আওয়াজে সজাগ হয়ে রজনীকান্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন-- কোথাও ছাপা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে কাছে টেনে বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। রজনীকান্তের সে কি আনন্দ! সে কি তৃপ্তি! তারপর মাথা নত করে সম্মতি জানালেন।

পরদিনই রজনীকান্ত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করে জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে আলিঙ্গন করে বললেন, ... সে গান দুটি আমায় আবার শোনাও রজনীবাবু।

রজনীকান্তের দু'চোখ থেকে আনন্দজ্যোতি বেরিয়ে এল। গান দুটি তিনি আবারও পরিবেশন করেছিলেন।

এরপর, এরপর দীর্ঘ পথ চলা। প্রথমে কাশীতে চিকিৎসা, তারপর যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত একটি ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে সারপেনটাইন লেন থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলেন। মেডিকেল কেলেজের বড় চিকিৎসকরা পরীক্ষা করলেন। স্থির হল ক্যান্সার। অস্ত্রোপচার করতে হবে। অস্ত্রোপচার হল। চিরকালের জন্য 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'-এর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। মেডিকেল কলেজের ১২ নং কটেজে তাঁকে রাখা হয়েছে। পরিবার-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই রাজশাহীর এক ছাত্র-ডাক্তার হেমেন্দ্রনাথ বক্সী সেবা-পরিচর্যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা শহরে ছোট বড় সকলের কাছে রজনীকান্তের অবস্থার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। ২৮শে জৈষ্ঠ, শনিবার ১৩১৭ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এলেন রজনীকান্তকে দেখতে। মেডিকেল কেলেজের সেই '১২ নং কটেজে'। শুয়ে ছিলেন যন্ত্রণা-কাতর, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-শ্লথ রজনীকান্ত। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন-- শোনা মাত্রই সব গ্লানি, সব অবসাদ ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে, বহুদিনের আশা, বহু আকাঙ্খায় সঞ্জীবিত রবীন্দ্র-চরণ স্পর্শের ব্যাকুলতায় কেঁপে কেঁপে রবীন্দ্রনাথের চরণ দুটো স্পর্শ করলেন। কি বলে সম্বোধন করবেন-- কিন্তু কণ্ঠে আওয়াজ নাই! হঠাৎই চুপ করে চোখের জলভেজা আলোয় রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন-- প্রাণ ভরে দেখলেন-- ভুলে গেলেন সকল যন্ত্রণা, তাপ আর ছিন্নভিন্ন চেতনার অবিন্যস্ততা। রবীন্দ্রনাথ একটি চেয়ারে বসলেন -- অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন রজনীকান্তের দিকে। গলায় স্বর নেই, তাই কাগজ-কলম হাতে নিয়ে কবির চরণ পাশে এসে লিখলেন--...আমার যাত্রা সফল হইল। তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া, তোমারি 'কণিকা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছি। আশীর্বাদ করুন আমার 'দয়াল', যেন আমার যাত্রা সফল হয়...

রজনীকান্তের এই আর্তিতে স্তব্ধ হিমালয়-সম রবীন্দ্রনাথ। কি বলে সমবেদনা জানাবেন! রবীন্দ্রনাথ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন রজনীকান্তকে।

'আঃ সে স্পর্শ অমৃত স্পর্শ। সব যন্ত্রণা যেন জুড়িয়ে গেল।'

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে চৈতন্যের ঢেউ আছড়ে পড়ছে অনবরত, সেই নির্বাক, মূক রজনীকান্তের জন্য। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন-- 'শরীর কেমন আছে!' হাসপাতালের কটেজটিতে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো আকুল সুখ-কামনায়। 'শরীর কেমন আছে!'

রজনীকান্ত তাড়াতাড়ি লিখে জানালেন -- ...এই করে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান, মহাপুরুষ...

রজনীকান্ত মাথা নত করে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। শান্ত-প্রশস্ত, অমৃত-স্নিগ্ধ, সর্ব দুঃখ-বহনকারী রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের মাথায়, সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলেন। রজনীকান্ত আবার লিখলেন, ...আপনি আমাদের সাহিত্যনায়ক, দার্শনিক, চরিত্রে, সহিষ্ণুতায়, প্রতিভায় দেশের আদর্শ। তাই দেখে গেলে একটু পুণ্য হবে বলে দেখতে চেয়েছিলাম। নিজের আপনার পায়ের কাছে যাবার শক্তি নাই।

...কি শক্তি আপনার নাই?

অর্থশক্তি?...

রজনীকান্ত লিখলেন, ...আর একবার যদি দয়াল কণ্ঠ দিত, তবে আপনার 'রাজা ও রাণী' একবার অভিনয় করে দেখাতাম।

আবার লিখলেন, ...আমার লেখা 'অমৃত'-এর ছোট কবিতাগুলি কি পড়েছিলেন?

ধীরে ধীরে রজনীকান্ত বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সম্মুখে ভগবানকে দেখে একদিকে যেমন আনন্দিত, কৃতজ্ঞ, অপরদিকে হৃদয়ের সব না বলা কথা জানাবার সুযোগের ব্যবহার করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

পর পর লিখে জানাতে লাগলেন:

...আমি চার মাস হাসপাতালে...

...আমি চলে গেলে যদি নিতান্ত দিনহীন বলে একটি স্মৃতি থাকে...

...আমার হিসাবে আমি একটু শীঘ্র গেলাম।...

রবীন্দ্রনাথ আবার স্পর্শ করলেন রজনীকান্তকে। আশীর্বাদের মাধ্যমে আশ্বস্ত রজনীকান্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে মহানায়ক, দয়াল প্রতিনিধি, বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত রবীন্দ্রনাথকে বিদায় জানিয়েছিলেন সেদিন।

A Welfare Endeavour of Gandhi Seva Sangha

GSS Hospital OPD Services Gandhi More Sreebhumi, Kol- 700048

Doctors Name	Specialisations	Time Schedule
1. Dr. Sudipta Chattopadhay	Medicine & Diabetology	Tues 5-7 pm, Fri 4-6 pm
2. Dr. Subhadip Pal	Medicine & Diabetoogy	Tues 5-7 pm
3. Dr. B. K. Gupta	Medicine & Diabetology	Thurs 7-8 pm
4. Dr. S. B. Roy Choudhury	Medicine & Deabetogy	Tues 4-6 pm
5. Dr. Swapan De	Cardiology	Mon 7-4 pm, Thurs 4-5 pm
6. Dr. Sumit Acharya	Cardiology	Mon & Fri, 4-6 pm
7. Dr. Anirban Kundu	Cardiology	Sat 10-12 am
8. Dr. Sabyasachi Ray	Gastroenterology	Thurs 7-8 pm
9. Dr. Subhabrata Ganguly	Gastroenterology	Tues 6-8 pm
10. Dr. T. Karmakar	Orthopaedic	Tues 6-7 pm
11. Dr. A. K. Sing	Orthopaedic	Thurs 4-6 pm
12. Dr. Sudipta Bandapadhyay	Orthopaedic	By Appointment
13. Dr. Ashok Mandal	Gynaecology & Obstetrics	Tues & Fri 12am-1 pm
14. Dr. D. Ganguly	Gynaecology & Obstetrics	Mon12-2 pm, Fri 4-6 pm
15. Dr. Bandana Pal	Gynaecology & Obstetrics	Wed & Fri 6-7 pm
16. Dr. Trina Sengupta	Gynaecology & Obstetrics	Thurs 4-6 pm
17. Dr. R. K. Biswas	Paediatric	Fri 10-12 am
18. Dr. Dr. Tapas Kr. Chandra	Paediatric	Wed 9-11 am
19. Dr. A. C. Kundu	Chest Medicine	Mon 4-5 pm
20. Dr. Joy Basu	Family Medicine & Skin	Mon 6-8 pm, Thurs 6-8 pm
21. Dr. Subhas Kundu	Family Medicine & Skin	Tues 11-12 am
22. Dr. Diptendu Sinha	Surgery	Mon & Wed 11-1 pm
23. Prof. Dr. Anup Majumder	Oncology	Wed 11-1 pm
24. Prof. Dr. Srikrishna Mandal	Oncology	Tues 7-8 pm
25. Prof. Dr. Ajit Saha	ENT	Tues & Thurs 10-12 am
26. Dr. S. Chandra	ENT	Fri 10-11 am
27. Dr. Saibal Mitra	Eye	Wed 6-7 pm, Sat 5-6 pm
28. Dr. Rupam Roy	Eye	Mon 6-8 pm
29. Dr. Saradi Banerjee	Family Physician	
30. Dr. Mousumi Saha	Family Physician	
31. Dr. Indranil Basak	Family Physician	
32. Dr. Sayantan Manna	Family Physician	
33. Dr. Jayanti Poddar	Family Physician	
33. Dr. Aniruddha Maitra	Paediatric	
34. Dr. T. K. Chattaraj	**MD**	Tues & Fri 9-10 AM

General Physician is available everyday.
Special Doctors of Nephrology, Neuro and some other disciplines will be available shortly.
Under installation are fully equipped Dental Unit under Senior Dental Surgeon* Modern Pathology Labrotary* Digital X-Ray (Siemens)* Computerised Eye Unit
OPD is open MON to SAT, 9 am-1 pm, 4 -8 pm.

Appointment & Enquiry 9903321777, 9836066910.
Doctor Consultation fees Rs. 100, 150, 200/- only.
All diagnostic tests at high discount rates.

আনন্দ সংবাদ-আনন্দ সংবাদ-আনন্দ সংবাদ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালে

ডেন্টাল ও ম্যাক্সিলোফেশিয়াল ক্লিনিকের

পরিষেবা

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ●১১তম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com